উন্নয়নের সাত বছর

অর্থ বিভাগ

রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব অর্থ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির সার্বিক গতিধারা মূল্যায়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়ন; রাজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং এর সাথে মুদ্রানীতি ও বিনিময় হার নীতির সমন্বয়,মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় জাতীয় বাজেট প্রস্তুত ও বিভিন্ন খাতে সম্পদ বরাদ্দ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সরকারি ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ অর্থবিভাগের প্রধান দায়িত্ব। এ বিভাগ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন এবং আর্থিক বিধিবিধান প্রণয়নসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীও সম্পাদন করে থাকে। অর্থ বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হলো-

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি তরান্বিতকরণ ও দারিদ্র্য নিরসন;
- দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা;
- আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও অপচয় রোধ;
- সম্পদের সুষম বন্টন ও সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- বাজেট বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;
- সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং রপ্তানি খাতকে উৎসাহিতকরণ।

বিগত সাত বছরের কার্যক্রম

১. বাজেট প্রণয়ন, সম্পদ বন্টন ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা

১.১ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন

অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতি অর্থবছরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল সভার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে বৈশ্বিক ও জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক গতিধারা বিশ্লেষণ এবং রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতির সমন্বয় সাধন করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো চূড়ান্তকরণে অর্থ বিভাগ মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই কাঠামোর ভিত্তিতে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিকৌশলসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় প্রতি অর্থবছরে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণের নির্ভরযোগ্যতা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেইজ তৈরির কাজ চলমান। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (Medium Term Budget Framework-MTBF) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবংঅন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Ministry Budget Framework-MBF) প্রস্তুত করছে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং রবাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র বজায় থাকে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে গাইড লাইন জারি করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের Budget Implementation Plan (BIP) প্রণয়ন করেছে। আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পাশাপাশি, বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS) কে উন্নত করে আইবাস ++ এ রূপান্তর করা হয়েছে।

১.২ সম্পদ বন্টন

সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকৃতির সাথে সম্পৃক্তকরণের জন্য কর্মকৃতি মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট অনুবিভাগ/শাখা খোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি মন্ত্রণালয়ে মধ্যমেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (Medium Term Strategy Business Plan (MTSBP) তৈরির কাজ চলছে। বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনেকখানি শক্তিশালী করা হয়েছে।

১.৩ সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

যথাযথ ব্যয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে শুরু থেকেই প্রচেষ্টা নেয়া হয়। অর্থবছর ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ,২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ এ সরকারি ব্যয় ও জিডিপি'র অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১৪.৩, ১৪.৬, ১৪.০, ১৪.৪, ১৪.৬, ১৪.০ , ১৩.৪ ও ১৫.৩ (সংশোধিত) শতাংশ। বস্তুত বিগত সাত বছরে রাজস্ব নীতি প্রণয়নে অর্থ বিভাগ যথেষ্ট প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেয়। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অর্থ বিভাগে গৃহীত নীতিকৌশলসমূহের কারণে একদিকে যেমন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালনের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুসংহত হয়েছে। ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অর্থ বিভাগের গৃহীত নীতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে ছিল -

- ভর্তুকি ও রাজস্ব সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে জ্বালানি মূল্য সমন্বয়। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারের মধ্যকার জ্বালানি মূল্যের ব্যবধান যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ;
- বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারের জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। ফলে জ্বালানি খাতে ভর্তুকির চাপ প্রশমিত হয়েছে; অধিকন্তু,জ্বালানি তেলের বিদ্যমান মূল্যও কমানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজারের জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাসের প্রভাব বিবেচনা করে পরবর্তীতে আবারো দাম কমানো হতে পারে।
- বাজেট ঘাটতি অব্যাহতভাবে জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা;
- ঘাটতি অর্থায়নে সহজ শর্তে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা জোরদারকরণ;
- ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ ও বিনিয়োগ সচল রাখার উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ বা ব্যাংক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ সীমিত পর্যায়ে রাখা।

১.৪ ঘাটতি অর্থায়ন

মুদ্রা সরবরাহসহ সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি অর্থায়নের প্রভাবের বিষয়টি মাথায় রেখে এ বিষয়ে শুরু থেকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। ২০০৯ সালে প্রণীত সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন এর বাধ্যবাধকতার আলোকে বাজেট ঘাটতি ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে একে জিডিপি'র শতকরা ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা হয়। এ লক্ষ্যে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের ওপর জোর দেয়া হয়, অন্যদিকে তেমন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি ব্যয় হ্রাসের জন্যমূল্য সমন্বয়, অর্থ ছাড়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও উপযোগী আর্থিক বিধি-বিধানপ্রণয়ন করা হয়। পাশপাশি সহজশর্তের বৈদেশিক সহায়তা লাভের জন্যও পদক্ষেপ নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহজশর্তের ঋণ সহায়তা (Extended Credit Facility) চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এছাড়াও সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আধুনিক সফট্ওয়্যার স্থাপন এবং সরকারের শেয়ার ও ইক্যুইটির হিসাব ব্যবস্থাপনায় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.৫ আইনগত সংস্কার

বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদানে দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা অর্জনসহ আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে যে সকল আইনী ও বিধিগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ও পরিকল্পনা শাখা সৃজন;
- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন;
- উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ম্যাপিং শুরু;
- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্তকরণ;
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন;
- জেলা বাজেট প্রণয়ন শুরু করা (টাঙ্গাইল জেলার জন্য প্রথমবারের মত পরীক্ষামূলক জেলা বাজেট পেশ);
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেইজ তৈরি;
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিকৌশল প্রণয়ন;
- সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নে লক্ষ্যে আধুনিক সফট্ওয়ার সংগ্রহ ও স্থাপন;
- বিভিন্ন সংস্থায় সরকারের ইক্যুইটির হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাটাবেইজ প্রস্তুত;
- পরীক্ষামূলকভাবে কর্মকৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা (Performance Audit)কার্যক্রম শুরু;
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ কয়েনেজ অর্ডার, ১৯৭২ সংশোধন করে পাঁচ টাকাকে ব্যাংক মুদ্রা থেকে সরকারি মুদ্রায় রূপান্তর করা হয়েছে;
- সন্ত্রাস বিরোধ (সংশোধন) আইন ২০১২ প্রণয়ন;
- বীমা আইন ২০১০ পাশ;
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা ২০০১ সংশোধন;
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা ২০০৬ সংশোধন;
- দি এক্সচেঞ্জেস (ডিমিউচুয়ালাইজেশন) অ্যাক্ট ২০১৩ পাশ;
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা ১৯৯৬ সংশোধন;
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন আইন ১৯৯০ সংশোধন;
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯ সংশোধন;
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব ডেট সিকিউরিটিজ) রুলস্ ২০১২ প্রণয়ন;
- ব্যাংকিং আইন ১৯৯১ এর সংশোধন;
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ প্রণয়ন;
- পিপিপি পলিসি ও নীতি এবং গাইড লাইনস ২০১০ গেজেট আকারে প্রকাশ;
- Viability Gap Fund ব্যবহারের জন্য গাইডলাইন ও স্কীম প্রকাশ;
- প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিরর বেতন-ভাতা, পেনশন, পে-রোল, এবং অন্যান্য তথ্য সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরির কাজ শুরু।

২. বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা ও অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংকট বিশ্বের অনেক উন্নত অর্থনীতির দেশকে নাজুক অবস্থানে ফেলে দেয়। এর ফলাফলস্বরূপ, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় এবং বিনিয়োগ হ্রাস পায়। অথচ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলা করে অত্যন্ত সফলতার সাথে। বজায় রাখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির টেকসই গতিধারা। অব্যাহতভাবে উচ্চ গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে বিশ্বের এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সামনের কাতারে। এর ধারাবাহিকতায় প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান গড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু জিডিপি এবং জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ শতাংশে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ১,৩৮৪ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

২.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলা

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ যে সকল কৌশল গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে -

- ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন নীতি প্রণোদনাসহ ৩০ হাজার ৪২৪ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা সম্বলিত প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা
- রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকির পরিমাণ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- ২৫ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ঘোষিত দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং ফিণিশড্ ও ক্রাস্ট লেদার শিল্পের উন্নয়নে নগদ সহায়তা প্রদান
- বস্ত্র খাতে নতুন পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য রপ্তানি আয়ের ওপর বর্ধিত ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্রশিল্প খাতের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান
- তৈরিপোশাক ও বস্ত্রখাতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুবিধা বহাল রাখা
- রপ্তানিমুখী শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির অর্থায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বর্ধিতকরণ
- ২৭০টি পোশাক প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটসহ রপ্তানিমুখী বিভিন্ন রুগ্ন শিল্পের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ
- রপ্তানি পণ্যের বাজার কেন্দ্রিকতা ও এ সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাসে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য কুটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদারকরণ
- বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি পণ্য বহুমুখীকরণের প্রচেষ্টার ফলে চামড়াজাত পণ্য, আসবাব ইত্যাদি নতুন ধরনের পণ্য রপ্তানি
- অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রপ্তানি পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণে নীতি সহায়তা প্রদান
- মন্দা মোকাবেলায় তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে (২০০৯-১০ অর্থবছরে) ঋণের সুদের সর্বোচ্চ সীমা (১২% থেকে ১৩%) নির্ধারণ করা
- মন্দার অভিঘাত মোকাবেলায় সহযোগিতা করার লক্ষ্যে পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পকে ঋণ পুন:বিন্যাসের সুবিধা প্রদান করা

২.২ অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সচল রাখা

প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যয়ভিত্তিক খাতওয়ারি অবদান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৩ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৭৪ শতাংশ। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদার অবদান ছিল ৩.২৩ শতাংশ। অর্থবছর ২০১৫-তে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৫৫ শতাংশ, যেখানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির অবদান ছিল ৪.৬৬ শতাংশ। এ থেকে অনুমান করা যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো অভ্যন্তরীণ চাহিদা।

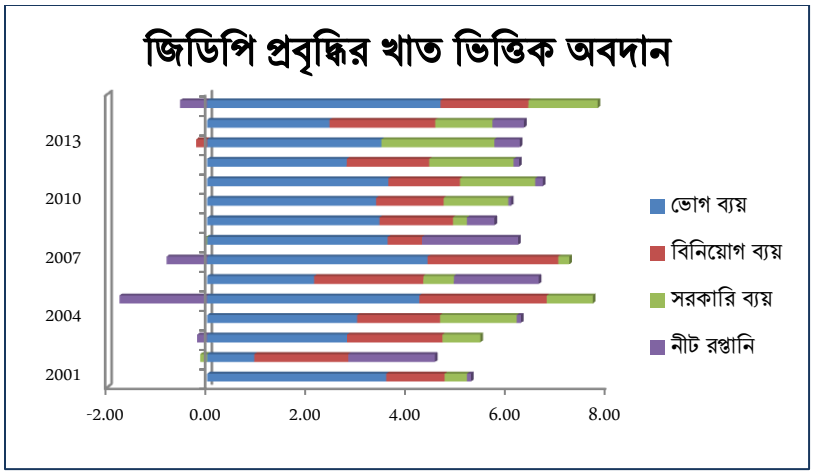

কৃষিখাত ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে সরকারের বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, উচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতি-সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সচল রয়েছে। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান, মানসম্মত বীজ সরবরাহ, বন্যা ও লোনা পানি সহিষ্ণু শস্য উদ্ভাবন, কৃষকদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা,উৎপন্ন শস্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের মত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে গ্রামীণ অবকাঠামো, পল্লী আবাসন, স্যানিটেশন, ভূমি ও পানি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং গ্রামাঞ্চলে অকৃষি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় এনে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়া হয়। সরকারের খাদ্য মজুদ ক্ষমতা ১৪ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ২০.০৯ লক্ষ টনে উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদার চলমান ধারা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যাভিমুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ করা হয়। বিদ্যুৎ সমস্যাসহ অন্যান্য যোগান সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে (জ্বালানি, বন্দর, পরিবহণ ও যোগাযোগ) চাহিদানুপাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন এবং জ্বালানি বহুমুখীকরণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিশেষ গুরুত্ব পায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের বিষয়টি। সর্বোপরি ব্যক্তি খাতের আস্থা অর্জন এবং ব্যক্তি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে ব্যবসা ব্যয় হ্রাসের জন্য বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের মত কার্যক্রমসমূহ দেশি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

বহুল কাংখিত ৮ম জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সর্বনিম্ন বেতন ৮,২৫০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৭৮,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করে অনলাইনে বেতন ও পেনশন নির্ধারণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। বর্ণিত সময়ে দেশে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অনলাইন তথ্য ভান্ডার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে ঋণ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বোপরি সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুনগতমান উন্নয়ন করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সঞ্চালক এ সকল কার্যক্রমে নীতি কৌশলপ্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণসহ বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে অর্থ বিভাগ।

৩. বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবেলা করে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ বৃদ্ধি ও জ্বালানি বহুমুখীকরণ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেবিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে শুরুতেই প্রণয়ন করা হয় ‘Power Sector Master Plan’। এর আওতায় গৃহীত নানামুখী কর্মকান্ডের ফলে জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে ৪ হাজার ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নতুনভাবে সংযোজিত

হয়েছে। বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৩ কিলোওয়াট আওয়ার থেকে বেড়ে ৩৭১ কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১২ হাজার (ভারত হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ) মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। একই সাথে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন উৎস অনুসন্ধান ও জ্বালানি বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তেল গ্যাস অনুসন্ধান,উৎপাদন,বিতরণ ও এখাতের উন্নয়নে বিনিয়োগের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল'। এছাড়া,শক্তিশালী করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে। এসকল উদ্যোগের ফলে ২৬টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ হাজার ৮০০ মিলিয়ন ঘণফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। দৈনিক গড়ে ১২২০ ঘণফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডেযুক্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা উন্নীত হয়েছে ১০ লক্ষ ৯১ হাজার মেট্রিক টনে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অব্যাহত অর্জনের পেছনে অর্থ বিভাগের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিদ্যুৎ বিভাগের সহায়তায় এবং অর্থ বিভাগের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও শ্রমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে প্রণীত হয়েছে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা এবং প্রণীত হয়েছে অর্থবছরভিত্তিক কর্মকৌশল। অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি মূল্যস্ফীতির ওপরযেন বাড়তি চাপ তৈরি না করে তা নিশ্চিত করতে মূল্য সমন্বয়সহ সরকারি ব্যয় ব্যবস্থপনায় অর্থ বিভাগকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। তদুপরি আবশ্যকীয় আবকাঠামো নির্মাণসহ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালন, বাংলাদেশপেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনএর মত সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের দায় পরিশোধসহ বিভিন্ন আঙ্গিকে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতের অব্যাহত উন্নয়নে বিগত সাত বছরে অর্থ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

৪. কর্মসংস্থান

বিগত সাত বছরে কৃষি ও গ্রামীণ খাতে উচ্চমাত্রার ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি,শ্রমঘণ শিল্প স্থাপন এবং ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অর্থ বিভাগে সম্পাদিত গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে শুরু করা হয়েছে ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যুবক/যুব মহিলাদের জন্য গঠন করা হয়েছে ন্যাশনাল সার্ভিস। ন্যাশনাল সার্ভিস গঠন, ১০০ দিনের কর্মসৃজন, চর জীবিকায়ন ইত্যাদি লক্ষ্যনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রামীণ জনপদে মৌসুমী বেকারত্ব দূর করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণির পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ, স্থানান্তর ও প্রয়োজনে বিলুপ্তকরণের মাধ্যমেও অর্থ বিভাগ কর্মসৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সরকারি খাতের পাশাপাশি দ্রুত বিকাশমান বেসরকারি খাতও কর্মসংস্থানে অবদান রেখেছে।

অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার ছাড়াও বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানি বাড়াতে বিভিন্ন নীতি কৌশল প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পুরোনো শ্রমবাজারে জনশক্তির চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ব্যয়ে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে;অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ডাটাবেইজ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও তা থেকে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। বিমান বন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ শাখা খোলা হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩'। অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য 'দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন' করে তার মাধ্যমে বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। 'দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিট্যান্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'গঠনের মাধ্যমে আন্ত:মন্ত্রণালয় কার্যক্রমের সমন্বয় করা হচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা শ্রমিক রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' স্থাপন ও শাখা সম্প্রসারণকরা হয়েছে। সরকারের এসকল কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ হতে বর্তমানে প্রায় ১৬০টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে মার্চ, ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৩৩ লক্ষ ৭১ হাজার কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে।

দেশে ও প্রবাসে কমর্সৃজন ও দক্ষতা উন্নয়নেতহবিল গঠণ, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, নীতি সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান, বেসরকারি খাতের বিকাশোপযোগী পরিবেশ সৃজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিগত সাত বছরে অর্থ বিভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ কর্মসংস্থানের

ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করেছে। অর্থ বিভাগ Skills for Employment Investment Program এর আওতায় তিন ধাপে মোট ১৫ লক্ষ লোকের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এতে শিল্পখাতের বিভিন্ন ট্রেডের প্রয়োজন বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ কোর্স ও কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে। তিনটি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৩২টি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ, পিকেএসএফ এবং ৯টি বেসরকারি শিল্প সংগঠনের (Industry Association) মাধ্যমে উন্নত ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মীদের মধ্যে ন্যূনতম ৭০ শতাংশের চাকুরির ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে Industry Skill Council গুলোকে শক্তিশালী করা হবে যাতে তারা শ্রমবাজার সমীক্ষা, প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন

সুস্থ, শিক্ষিত, দক্ষ ও সচেতন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ছাড়াও সাংস্কৃতিক বিকাশে অবকাঠামো উন্নয়ন, নীতিগত ও কাঠামোগত সংস্কারে পর্যাপ্ত সম্পদ সঞ্চালনসহ নীতিগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অর্থ বিভাগের পক্ষ হতে। শিক্ষাখাতে বিগত সাত বছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শতভাগ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ, 'শিক্ষানীতি ২০১০' ও 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯' প্রণয়ন, সুবিধাবঞ্চিত ৭ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ, শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন'গঠন ইত্যাদি। অর্থ বিভাগে প্রণীত 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ' শীর্ষক গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২'।

স্বাস্থ্য খাত সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে আছে-নার্সিং ইনস্টিটিউট, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা, ৪টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিভিন্ন পদে ৪০ হাজার জনবল নিয়োগ, রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা প্রণয়ন, উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি চালুকরণ, নগর এলাকায় গর্ভবর্তী মা, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে কার্ড বিতরণ ইত্যাদি।

৬. সামাজিক খাত

সামাজিক খাত উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর মূল্য সংযোজনে যথেষ্ট অবদান রাখে। এ কারণেই সরকার বাজেট বরাদ্দের প্রায় ২০ শতাংশ হারে অর্থ আর্থ সামাজিক খাতে ব্যয় করে আসছে। সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন এবং প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। অপরদিকে দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই নারী, শিশু ও যুবক। তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাসমূহকে সরাসরিভাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। এ জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান) ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭. অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে গতিশীলতা আনয়ন

রাজস্ব আহরণকে জোরদার করতে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিধিগত সংস্কার, ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ সাধন এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের আধুনিকায়ন, দেশব্যাপী জরিপ এবং নতুন নতুন কর অফিস খোলার মাধ্যমে নতুন করদাতা চিহ্নিতকরণ, করদাতার সেবার মান বৃদ্ধির জন্য আয়কর নির্ধারণ ও পরিশোধে One stop Service পদ্ধতির প্রবর্তন,

জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্যের ভিত্তিতে ই-টিন রেজিস্ট্রেশন,মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন, কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং এর ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, জাতীয় রাজস্ব
বোর্ডের অনিস্পন্ন মামলাসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্টে নিবেদিত বেঞ্চ স্থাপন, ASYCUDA World soft-ware স্থাপনের মাধ্যমে শুল্ক প্রশাসনের অটোমেশন এর মত কার্যক্রমসমূহ কর রাজস্ব আহরণে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছে। সঞ্চয় হাতিয়ারগুলোকে বাজারভিত্তিক রাখার ফলে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্তি বাড়ছে।

৮. সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বেসরকারি বিনিয়োগের ধীর গতি থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। অবকাঠামো খাতে চলমান কার্যক্রম, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এর পাশাপাশি প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সুস্থিতি সামনের দিনগুলোতে বিনিয়োগ পরিবেশে অর্থবহ পরিবর্তন আনবে এবং ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ চাঙ্গা করবে। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার সম্ভাবনাময় বিভিন্ন স্থানে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করবে। ইতোমধ্যে সরকারি পর্যায়ে ৪২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী ১০টি বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প (Transformational Project) দ্রুততম বাস্তবায়নের জন্য প্রদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এগুলো হলো, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ ও পায়রা সমুদ্র বন্দর। সম্প্রতিক সময়ে আরো একটি প্রকল্প দোহাজারী-রামু-গুনদুম রেল প্রকল্প এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বাজটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ প্রকল্পসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এছাড়াও,বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রাপ্তিতে বিলম্ব, বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকরণে প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা, নিষ্কণ্টক জমির অভাব, ঋণের উচ্চ সুদের হার ইত্যাদি বাধা অপসারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধি সহায়ক এসব কর্মসূচিতে অধিক সম্পদ সঞ্চালন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানে অর্থ বিভাগ কার্যকর ভূমিকা রাখে। একই সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্যোগকে সফল করতে বিধিগত কাঠামো প্রণয়ন (বাস্তবায়ন সহায়ক পরিপত্র জারি) এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি (অর্থ বিভাগে পিপিপি ইউনিট গঠন, লোকবল নিয়োগ) সম্পন্ন করা হয়। ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক পিপিপি কারিগরি সহায়তা খাত তহবিল স্কীম ও গাইডলাইন গেজেট আকারে জারি করা হয়েছে।

৯. মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান সরকারের অন্যতম নীতি কৌশল হচ্ছে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রবৃদ্ধির গতিকে গতিশীল ও টেকসই করা। দক্ষ ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতির যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দ্রব্যমূল্যের চাপ প্রশমণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও কাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মুদ্রা সরবরাহ যাতে বাজারে অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি করে মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে না দেয় সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে;উৎপাদনশীল খাতে বিশেষ করে মেয়াদি শিল্প ঋণ ও এসএমই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলোর উপর তদারকি বাড়ানো হয়েছে; অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের যোগান নিরুৎসাহীত করা হচ্ছে;অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যথাসময়ে আমদানির সুবন্দোবস্ত ও বাজার পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ কর হয়েছে; মূল্যস্ফীতিতে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগণের ওপর চাপ বেশি পড়ে। এই চাপ সহনীয় পর্যায়ে রাখতে খাদ্যপণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে খোলা বাজারে চাল বিক্রিসহ পর্যাপ্ত খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে এপ্রিল, ২০১৬-তে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৬১ শতাংশে দাঁড়ায় যা এপ্রিল, ২০১৫-এ ছিল ৬.৩২ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য হ্রাস, সহায়ক রাজস্ব ও মুদ্রা নীতি, সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে চলতি অর্থবছর শেষে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার (৬.২ শতাংশ) নীচে থাকবে বলে আশা করা যায়।